ফিরে এসো, চাকা

নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ

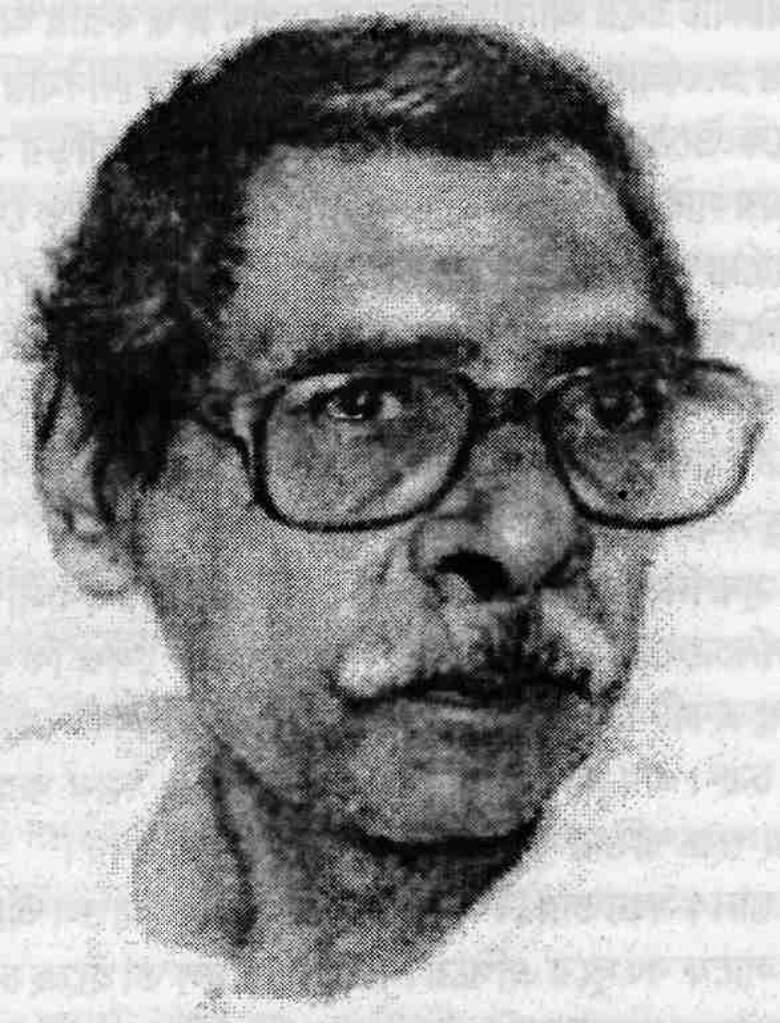

আরামবাগ বাজার ঘাটে দ্বারকেশ্বর নদী পেরিয়ে আরামবাগ কলেজে যাওয়ার রাস্তা। ঘাট থেকে বাজারে আসার আগে রাস্তার পাশে ছিল মদন চৌধুরীর 'চৌধুরী আর্ট স্টুডিও'। মদনদা, মদন চৌধুরী, নিজ হাতে বোর্ড লিখতেন। নানা ধরণের অক্ষর লেখা ছাড়া বোর্ডে থাকতো খদ্দেরের পছন্দ মতো ছবিও। নানা ধরণের উপহার সামগ্রীও বিক্রি করতেন মদনদা। থাকতো উপহার দেবার মতো আকর্ষণীয় বইও। রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের পথে কবে যেন মদনদার দোকানে ঢুকে পড়েছিলাম। অকৃতদার মদনদার সঙ্গে আলাপ এবং বোর্ডের লেখা ও রেখার শৈল্পিক স্বাক্ষর, মনকাড়া বইয়ের সম্ভার মদনদার দোকানকে আমার দ্বিতীয় ঠিকানা করে দিয়েছিল। বর্তমানে স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষ, কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বহু অভিনীত নাটক 'গরুর গাড়ীর হেড লাইট'-এর লেখক ও আরামবাগ কলেজের তৎকালীন ছাত্র সরোজ রায়, জীবনানন্দ দাশের কাব্য আলোচনা গ্রন্থ 'একটি নক্ষত্র আসে'-ব লেখক অম্বুজ বসু, 'চোখের আলোয় দেখেছিলুম' উপন্যাসের লেখক শান্তিনিকেতনের ছাত্র আরামবাগের বাসিন্দা হরিপ্রসাদ মেদ্দা, 'তুলি বৌদি' উপন্যাসের লেখক ডা: সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নিয়মিত আসতেন মদনদার দোকানে। মদনদাও প্রকাশ করেছিলেন 'ভোর হলো' নামে একটি উপন্যাস। ঐ দোকানের ঠিকানায় গড়ে তোলা হয়েছিল 'আরামবাগ শিল্প সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি সংস্থা। আমি কিছুদিন তার সম্পাদক ছিলাম। সংস্থার নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো—নাম 'প্রবাহ'। মদনদার দোকানে বসত নিয়মিত সাহিত্যের আড্ডা। উপরোল্লেখিত বইগুলোর পাণ্ডুলিপি পড়া হয়েছিল কোন না কোন আড্ডায়। সভায় সদস্যরা নিজ নিজ পয়সায় কেনা পত্র-পত্রিকা

বা বই আনতেন। কখনও কখনও সেসবও পড়া হত। এমনই একদিনের আড্ডায় হাজির হয়েছিল 'ফিরে এসো, চাকা'। বইটি নিয়ে আলোচনাও করেছিল একজন। ষাটের দশকের সেই আলোচনার স্মৃতি আজও অমলিন। অনেক পরে 'ফিরে এসো, চাকা' নিয়ে নানা ধরণের মন্তব্য শুনে বা পড়ে গাণিতিক চেতনার কবির সেই বইয়ের প্রতি আলাদা আকর্ষণ বোধ করি।

কৈশোরে ঠাকুমার সঙ্গে ঘিঘাট গিয়েছিলাম মকর সংক্রান্তির স্নানে। ঘিঘাট মেলায় ঠাকুমার বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে ঠাকুমাকে তাঁর বাড়ি কইরাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি আপত্তি করি এবং আমার অপত্তি অগ্রাহ্য করে ঠাকুমা কইরাতায় যেতে চাইলে রাস্তায় কান্নাকাটি করে আমি ঠাকুমার যাত্রাপথ রুদ্ধ করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছিলাম।পথ যাত্রায় ক্লান্ত ও কান্নাকাটি জেদাজেদিতে শ্রান্ত আমি দিদিমার বাড়ি গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে পরদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সংলগ্ন কুমোর পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে চাকার সাহায্যে মাটির হাড়ি কলসী ইত্যাদি বানাতে দেখে অমি তো অবাক! কারিগর চাকার সাহায্যে সৃষ্টি রহস্যের এক নব দিগন্ত আমার সামনে সেদিন উন্মোচন করেছিল। কৈশোরের সেদিনের কী উত্তেজনা! যৌবনের উষালগ্নে 'ফিরে এসো, চাকা' সেই উত্তেজনার স্মৃতি জাগ্রত করলেও সাম্মানিক গণিতের ছাত্র হওয়ায় পাঠক্রমের চাপে বিনয় মজুমদারের কাব্য পাঠে আনন্দিত হলেও 'ফিরে এসো, চাকা'-র রহস্য ভেদে উৎসাহিত হতে পারিনি; তা হতে সময় লেগেছিল আরও কুড়ি বছর।

সুদর্শন চক্রের ধারণার আবহমণ্ডলে ভারতবাসী তথা বাঙালির অবস্থান। কত না মিথ সুদর্শনচক্রকে উপলক্ষ্য করে। অশোকচক্র সেও কি কম কথা! উপনিষদে বর্ণিত সত্য চক্র হলো একটি ত্রিমুখী সিংহের পায়ের নীচে একটি ছোট চক্র আর মাথার উপর আর একটি বড় চক্র। এর অর্থ হ'ল পশুশক্তি সত্যকে দমন করতে চাইলে সত্য আরও বড় আকার নিয়ে পশু শক্তির ঊর্ধ্বে নিজের স্থান করে নেয়।

মানব সভ্যতার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে আগুন আবিষ্কার ছাড়া যে আবিষ্কার অগ্রগতিকে এক লাফে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা হচ্ছে চক্র বা চাকার আবিষ্কার। ফলে চক্রকে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হবে এটা আর আশ্চর্য কি। তার প্রভাব শিল্প সাহিত্যে পড়বে এটাইতো স্বাভাবিক।

বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬২ সাল। তিনি ভারতীয় পরিবেশেরই সন্তান। বিনয় মজুমদার কেবলমাত্র কাব্যচর্চা করতেন না। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কৃতি ছাত্র। রুশভাষা জানতেন। খবর রাখতেন দেশ-বিদেশের। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে চারপাশ দেখতেন। তাঁর সেই দেখা ও অনুভব করার ছাপ তাঁর প্রতিটি রচনায়। সেই দেখার ও অনুভূতির যথার্থ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিনয় মজুমদারের রচনা, রচনার নামকরণ নিয়ে আলোচনা সম্ভবত কোন সরল সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যেতে পারে। হয়তো বা তা অভ্রান্ত নাও হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রকাশকাল ১৯৬২ সাল। ষাটের দশক বিশ্ব পরিস্থিতির এক উত্তাল কাল। বিশ্ব রাজনীতি অর্থনীতিতে চলছে দ্রুত লয়ে ভাঙ্গাগড়ার পর্ব। কিউবা ভিয়েতনাম সংবাদের শীর্ষে। ১৯৫৭ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে প্রকাশ পেল ক্রুশ্চেভের গোপন রিপোর্ট। বিশ্বযুদ্ধের সময়

বিপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা করতে যিনি যথার্থ সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, যিনি পিকাসোকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর প্রতিকৃতি আঁকতে, যাঁর অনন্য মেধা আদায় করেছিল বার্নাড শ'র শ্রদ্ধা, পাবলো নেরুদা যাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সেই স্তালিনকে এক লহমায় বানিয়ে দেওয়া হল এক কলঙ্কিত নায়ক। এসব খবরে তখন আলোড়িত বুদ্ধিজীবী সমাজ। চাঞ্চল্য প্রসারিত হতে হতে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো। হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'নেকেড গড'-এ তার ব্যাপকতার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ক্রুশ্চেভের রিপোর্টের পরবর্তী একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন।

শিকাগোয় থাকতেন হাওয়ার্ড ফাস্ট। তামাক কিনতে যেতেন একটি দোকনে। দোকানের মালিকের বয়স হয়েছে। কিন্তু চোখের তারায় উজ্জ্বলতা, শরীরী ভাষায় আত্মসম্ভ্রম। তাঁর একমাত্র পুত্র স্পেনের গৃহযুদ্ধে 'রিপাবলিকান'দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে সে ছিল আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সদস্য। শত্রুর গুলিতে স্পেনের মাটিতেই পেতেছিল শেষ শয্যা। ক্রুশ্চেভের রিপোর্ট বেরুবার পরদিন তামাক আনতে গেলেন হাওয়ার্ড ফাস্ট। দেখলেন রাতারাতি যেন ন্যুব্জ হয়ে গেছেন তামাকের দোকানের মালিকটি। আলোকিত চোখের তারায় আর দীপ্তি নেই। যেন এক অসীম গহ্বরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ তাকালেন হাওয়ার্ড ফাস্টের দিকে—'আমি না হয় একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ... কিন্তু তুমি হাওয়ার্ড ফাস্ট। তুমি কেমন করে প্রতারিত হলে?'

পাঁচ-এর দশকের শেষে কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠকে মাও সে তুং জানালেন, চিনের অর্থনীতিকে ব্যক্তি মালিকানা থেকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় নিয়ে যেতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। মাও সেই সভায় বললেন, যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, ফিরে যাব ইয়েনের সেই গুহায়, শুরু করব এক নতুন লংমার্চ।

ভুলে যাওয়ার উপায় নেই, ষাটের দশকেই হয়েছিল শ্রীলঙ্কার যুব বিদ্রোহ, ফ্রান্সের ছাত্র বিদ্রোহ। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তত্ত্বগত বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং ৬২ সালে চরম আকার নেয়।

অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় বাজার সংকট তৈরী হয়। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অস্থিরতা তখন সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায়। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলেও যুদ্ধের আঘাত থেকে সরাসরি মুক্ত মার্কিনী অর্থনীতি যে প্রবল পরাক্রমে এগোচ্ছিল, পঞ্চাশের দশকের প্রান্তে এসে তাদের পায়ে কে যেন বেড়ি পরিয়ে দিল। সেখানে বর্ণ বৈষম্যের দ্বন্দ্ব এক কদাকার চেহারা নেয়।

শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর, 'মানুষ' কবিতায় লেখেন :

মানুষে মানুষ খায়, মেদ মজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ
খায়না আত্মা, খায় জীবনের অর্ধেক নিঃশ্বাস
অবশেষে—জীবন্ত কঙ্কাল ফেলে দেয়, করো কি
বিশ্বাস?
যাও সেথা যেথা কল-কারখানা, যাও গ্রামে গ্রামে
সচক্ষে প্রত্যক্ষ করো মানুষ্যত্ব চড়েছে নিলামে,

মানুষের মানুষ শিকারী,
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে
ভিখারী।

'চাকার নীচে' নামে একটি নাটকও লিখেছিলেন যা বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। এরকম অনেক রচনাই সেযুগে তরুণ মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতো, যুবকদের এক বিশেষ সমাজ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতো। সেযুগে রমা রলাঁও নতুন সমাজের স্বপ্নে বিভোর। ১৯৩৪ সাল স্পষ্টভাবে সোভিয়েতের প্রসংশায় পঞ্চমুখ। অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, ক্লেদাক্ত পুঁজিবাদীর বিকল্প হিসাবে যখন সোভিয়েতের মতো নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতো, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম রূপ ফ্যাসিবাদের ভয়ে যখন গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত, তখন সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি রলাঁকে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করেছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে জিদ Les Nouvells Nourritimes terrestres এর নায়ককে দিয়ে বলান, 'অন্যের সুখই আমার সুখ'। সেই জিদই পরে লেখেন Le Retour de L'URESS. জাঁ পল সার্ত্র ছিলেন সেযুগে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বুদ্ধিজীবী, যাঁকে মনে রেখে ১৯৪৫ সালের ৫ নভেম্বর রুজে মারাত্যাঁ দ্যুগার তাঁর জার্নালে স্বগতোক্তি করেছিলেন, সার্ত্র দিশার সন্ধানী সমস্ত তরুণকে টেনে নেবেন। এক রাজকীয় আন্দোলন দানা বাঁধছে... এক নতুন বাড়ি তৈরী হতে চলেছে, যেখানে বাস করবে আগামী দিনের সত্য।' কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ করতে কাম্যু, ল্যফর, এতিয়াঁবল ও মেরলোপাতঁর প্রমুখ জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতেও দ্বিধা করেন নি যে সার্ত্র, সেই তিনি সাতান্ন সালে 'স্তালিনের ভূত' নামে ১২০ পৃষ্ঠার নিবন্ধ লেখেন। অথচ সার্ত্রর নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান এক মস্ত বিবৃতি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সার্ত্র মরিস ব্লাঁশো ক্লসোভস্কি, লাঁকা ও নাদোর সঙ্গে 'ল্য মঁদ'-এ বিপ্লবী ছাত্রদের পক্ষে সই করেন। রেডিওর এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র বলেন, 'ছাত্ররা ওদের বাবার, অর্থাৎ আমাদের তৈরী ভবিষ্যতে বিশ্বাস করে না, যে ভবিষ্যৎ প্রমাণ করে আমরা ছিলাম অবসন্ন, ক্লান্ত, কাপুরুষ; এক বদ্ধ প্রক্রিয়ার কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্যের কারণে গাভীতে পরিণত....।' প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করলেন, "পূর্ণ গণতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল এক নতুন সমাজ-ধারণা জন্ম হচ্ছে, যা সমাজবাদ ও মুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত।' মৃত্যুর ২৫দিন আগে সার্ত্র এক বিতর্কিত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এই খারাপ, কুৎসিত ও আশাহীন' পৃথিবীতে—যেখানে দক্ষিণপন্থীরা 'হারামজাদা' ও বামপন্থী পার্টিগুলো 'বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শত্রু'—তিনি আশায় ভর করে আছেন মানুষের এক নতুন অভ্যুত্থানের জন্য।"

বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামী ভারতে, বিশেষত, বাংলায় যে চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটেছিলো উল্লেখিত শিবরামের কবিতার অংশটিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। চল্লিশের দশকে, কলকাতা উত্তাল, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ। এসবের রেশ ধরে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' আওয়াজ যুবরক্তে আগুন ঝরায়। গ্যালাহার-এর 'আ কেস ফর কমিউনিজম', চে, জেনারেল গিয়াপের লেখা ছাত্র যুবকে উদ্বেলিত করে। কল-কারখানায়, গ্রামে গ্রামে যাওয়ার জন্য যুব ছাত্ররা যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলো তার প্রভাব পড়েছিল বাংলার শিল্প সাহিত্যে, সংস্কৃতিচর্চায়। চল্লিশের দশকের চেতনা স্রোতে পঞ্চাশের শেষ দিক থেকে যেন ভাটায় টান দেখা দিল। বিশ্বে ধনবাদী ব্যবস্থায় সংকট ঘনীভূত হওয়ায় ভারতে

উদীয়মান বণিক গোষ্ঠীর রমরমা ব্যবস্থাপনাও নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। যার প্রভাব পড়েছিল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে; যা ষাটের দশককে আলোড়িত করেছিল। অর্থাৎ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের এক বড় অংশ নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিল। সলিল চৌধুরীর কথায় '... জ্বলন্ত সূর্যের মতো স্বপ্নগুলো কোথায় গেল? কিসের প্রত্যাশায় বাবা-মা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে পথকে ঘর করেছিলেন? চোখের সামনে কত তরতাজা ফুটন্ত ফুলকে আগুনে ঝলসে যেতে দেখলাম। কে তাদের মনে রেখেছে?—ছাত্র শহীদ রামেশ্বরের রক্তে আমার গা ভেসে গেছে—বুলেট আমাকেও বিদ্ধ করতে পারত। তাতে পৃথিবীর কার কি যেত আসত এক আমার মা-বাবা ছাড়া? জানি বিপ্লবের জন্য আত্মাহুতি চাই—বিপ্লব কেউ হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু যে বিপ্লবকে চল্লিশের দশকে পথের মোড়েই আমরা দেখতে পেতাম—আহার নিদ্রা সুখস্বাচ্ছন্দ এবং বেঁচে থাকাকে অবধি বাজি রেখে নেতাদের কথায় যার জন্য..., দেখেছিলাম সে বিপ্লবটা গেল কোথায়? কে সৃষ্টি করেছিল সে মরীচিকা যার প্রলোভনে হাজার কয়েকের ঘর পুড়ল—শয়ে শয়ে অহল্যা মরল—শ্রমিক ছাত্রদের রক্তে রাজপথ ভাসল? আমাদের সেদিনের স্বপ্নের সারথি স্তালিনকে, মাও-সে-তুঙকে কারা হত্যা করল? রুশকে চীনের—চীনকে রুশের শত্রু কারা করালো?

ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে তখন এ এক কঠিন প্রশ্ন। লক্ষ্যনীয় বাঙালি সম্প্রদায় তাতেও কিন্তু থেমে থাকেনি। কেননা তাদের ভাবনায় :

চলার চেয়ে বড় খবর অন্য কিছু নেই
চলার মধ্যে আগে পিছে বলে কিছু নেই।

বিশ্ব পরিস্থিতির ছাপ ভারতীয় অর্থনীতিতে ছিল তখন স্পষ্ট। বাংলা নাটক, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের দিক থেকে ছয়ের দশক এক ব্যক্তিক্রমী দশক। পৃথিবীকে বদলে ফেলার অমোঘ প্রেরণা রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র সব কিছুকে এনেছিল এক মোহনায়। বিনয় মজুমদার সেই মোহনায় ঝড়ো হাওয়ার উত্তাল পথের যাত্রী।

বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। এই নামকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা মিথ। অনেক সময় মিথ যেন সত্য মনে হয়।

'কী রহস্য যেন সর্বদা আমাকে ঘিরে রাখে।'

'রহস্য' কবিতার এই পঙক্তিটি যেন কবি বিনয় মজুমদারের নিজের জীবনযাপন, কাব্যকৃতি, প্রেম-বাসনা, বিষাদ-আনন্দের অনুরণন। তাঁর কবিতায় জননপ্রক্রিয়া, পদার্থবিদ্যা, জীবগণিত, কফি হাউস, পড়শি রঞ্জিত, পীযূষ ডাক্তার, কৃত্তিবাস, হাংরি আন্দোলন, বাবলা গাছ, লাঙল, হারাধন, বুচি, জীবনানন্দ, বাবা, মা, মানসিক হাসপাতাল, চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র, মঘা তারা, রেবতী, কৃত্তিকা, ছন্দভাবনা, সমাজভাবনা, সরস্বতী পূজা সব একাকার হয়ে গেছে। সেখানে কোন কাব্যের নামকরণ বা কাব্য ভাবনাকে বিশেষ কৌণিক বিন্দু থেকে মূল্যায়ন করলে মিথ আরও আরও মিথের জন্ম দেবে। বিনয়-রহস্য উন্মোচনে তাই বড়

বেশি সাবধানী হওয়া বোধ হয় শ্রেয়।

তাকাই সামনে সোজাসুজি
ব্যাকুল আশায় তাকে খুঁজি। (নক্ষত্রের আলোয়, সে)

যিনি ব্যাকুল আশায় তাকে খোঁজার প্রয়াস চালিয়েছিলেন সম্ভবতঃ সেই বিনয় মজুমদারকে খুঁজতে দু-চোখ ধারালো করা প্রয়োজন এবং এ কাজে কোন মিথ্যের শিকার না হয়ে মনে রাখা দরকার : সংযম কবিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এক দুরূহ তপস্যার মতো। (অদ্ভুত আঁধার এক)

কেননা বিনয় মজুমদারের কথায় :

নিষ্পেষণে ক্রমে-ক্রমে অঙ্গারের মতোন সংযমে
হীরকের জন্ম হয়, দ্যুতিময়, আত্মসমাহিত।

এ তো বিনয়ই শিখিয়েছেন। তাই মিথ নয় যুক্তসমীকরণে বিনয় প্রতিভার সন্ধান চালানো ভাল।

যে কোন গণিতসূত্র নিয়ে তার পরবর্তীদের
বাঁ পাশে আনার পরে সে সমীকরণে
সমান চিহ্নের পরে—ডান পাশে শূন্য হয়ে যায়।
এইভাবে কতিপয় যত খুশি সূত্র নিয়ে এগুলির বাম পার্শ্বগুলি
গুণ করে শুধুমাত্র একটি সমীকরণ সহজেই পাই
যার ডান পাশ শূন্য, শূন্যের সমান।
সদ্য উল্লিখিত এই একটি সমীকরণ জ্যামিতিতে রূপায়িত হলে
অনেক পৃথকরূপ পৃথক পৃথক চিত্র পাওয়া যায় সর্বদাই পাই।
মূল সমীকরণের— আলাদা আলাদা সব সমীকরণের
আলাদা সকল চিত্র একীভূত সমীকরণের
জ্যামিতিক রূপায়ণে পাওয়া যায়, তার মানে অনেক সূত্রকে
একীভূত করা যায় কেবল একটিমাত্র ক'রে ফেলা যায়।
তাতে আমাদের কিছু লাভ হয় এখানে আমার বৌ রাধা
এই লিখে রাখা ভালো সবার অবগতির জন্যই নিশ্চয়। (বাল্মীকির কবিতা)

প্রকল্পিত সমীকরণের পদ্ধতি অজানা থাকলে রাধার একীভূত সত্তার প্রসঙ্গ সহজবোধ্য হয় না। অজানা থেকে যায় রূপময়তার পরিসরে আলাদা হয়ে যাওয়া, আলাদা থাকা, বহুময়তা আর সমন্বয়, সমাবিষ্ট, একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা সূত্র— ভেদ ও অভেদের গমন পথ, পারস্পরিকতার রহস্য। বিনয়কে বুঝতে হলে বিনয়ী হয়ে বলা ভাল, গাণিতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া জরুরী; অন্যথায় মিথ মিথের জন্ম দেবে; বিনয় কেবলমাত্র অবিনশ্বর প্রেম

কাহিনীর প্রতীক হয়ে থাকবেন। মহাক্ষরের গাড়িতে চেপে মিথ প্রেমীদের যাত্রা পথ তখন মহাশূন্যের কোটরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

১৯৮২ সালে 'কোনো গোপনতা নেই' নামে 'কবিতীর্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বিনয় জানালেন, আমি লিখি—তোমরা পড়—তোমাদের যার যেমন লাগে। আসলে কি, পঞ্চাশের দশক একটা অদ্ভুত সময়—স্বাধীনতার ঠিক পরেই—প্রাণে আমাদের স্বপ্ন, এতদিনের দারিদ্র, গ্লানি বোধহয় এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে—কিন্তু কী হল তা তো দেখতেই পাচ্ছ—অবস্থার আরো অবনতি।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সাল। বিনয় মজুমদার প্রকাশ করলেন 'ফিরে এসো, চাকা'।

সেই সাক্ষাৎকারেই বাস্তব কবিতা বলে কিছু হয় কি— প্রশ্নের উত্তরে বিনয় জানালেন, পুরোটাই— কবিতার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য বাস্তব জগত, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। আচ্ছা কবিতা কি এমন হতে পারে না—ধর খাতা কলম নিয়ে রেল লাইনের ধারে গিয়ে বসলাম, যা দেখি ঠিক তাই লিখি— না দেখা একটা শব্দও যেন না থাকে—

যেমন ধর :

সামনেই ধানক্ষেত দীর্ঘায়িত হয়ে পড়ে আছে
ধানক্ষেতটির ওই পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে
উত্তরের দিক থেকে ঠিক দক্ষিণের দিকে—তাই দেখি...।

প্রশ্ন ছিল, নারীসংসর্গের অভাব বোধ কর না?

উত্তর ছিল, এটা ব্যক্তিগত— এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করব না। আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে গিয়েও সঙ্গমের আনন্দ পাই।

বাস্তববাদী কবি কবিতাকে কতটা জীবনসঙ্গী করেছিলেন এরপরেও কি বলার অপেক্ষা রাখে! এরপরেও কি কোন মিথ রচনার অবকাশ থাকে?

কবিতা লেখার মধ্যে আনন্দ পেতেন বিনয় মজুমদার। আনন্দতুল্য তো আর কিছু হয় না। প্রশ্ন ছিল, কবিতা লেখা শুরু করলে কেন?

উত্তর, মনের আনন্দই আসল কারণ—একটা ময়না পাখি শরতের বৃষ্টিতে ভিজছে—মিষ্টি মধুর ভাষায় এটা নিয়ে একটা কবিতা লিখলে—তাতে আনন্দ হয় না?

১৯৬১ সালে চোদ্দটি কবিতা নিয়ে 'গায়ত্রীকে' নামে বিনয়ের কবিতার বই প্রকাশিত হয়। ১৪-র সঙ্গে আরো প্রায় ৬৩টি কবিতা জুড়ে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থ। 'ফিরে এসো, চাকা'-র নাম পালটিয়ে একই কবিতাগুচ্ছ নিয়ে ১৯৬৪ সালে নতুন নামে প্রকাশিত হয় 'আমার ঈশ্বরীকে'।

সম্ভবতঃ নামকরণের কারণেই গায়ত্রী-চক্রবর্তী-চাকা-ঈশ্বরী সম্পৃক্ত হয়ে এক মিথের জন্ম দিয়েছিল এবং গাণিতিক চেতনার কবির বিশ্লেষণাত্মক ছন্দময় কাব্য প্রবাহকে 'হাতাশা জনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি' 'ব্যর্থ প্রেমিক-এর পাগলের প্রলাপ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মঞ্জুরীত করে কবি বিনয় মজুমদারের কাব্য ভাবনার মূলকে দৃষ্টির আড়ালে নেওয়ার সচেতন বা হেয়ালী প্রয়াস দেখা যায়।

'কবিতীর্থ' পত্রিকায় 'কোনো গোপনতা নেই' শিরোনামে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের কিছু

অংশ নিম্নরূপ :

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করলো— গায়ত্রীকে কি তুমি ভালবাসতে?

—আরে ধুৎ, আমার সঙ্গে তিন-চার দিনের আলাপ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের—তারপর কোথায় চলে গেলেন—আমেরিকা না কোথায় ঠিক জানি না।

—তাহলে ওকে নিয়ে কবিতা কেন?

—কাউকে নিয়ে তো লিখতে হয়—আমগাছ, কাঁঠালগাছ, রজনীগন্ধা নিয়ে কি চিরকাল লেখা যায়?

চাকা আবার ফিরে এলো। ঐ একই কাব্য ১৯৬৮ সালে 'ফিরে এসো, চাকা' নামে প্রকাশিত হয়।

বেশ কিছুকাল হল চলে গেছ, প্লাবনের মত
একবার এসো ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুদ্ধ ফলের মত আমি
জীবনযাপন করি; কদাচিৎ কখনো পুরোনো,
দেওয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোনো
মানুষীর আকৃতির মত তুমি দেখা দিয়েছিলে।
পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কুজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো; তুমি পুনরায় চলে গেছ।

কে অধরা ছিল, কে পালিত পায়রাদের মত ছন্দময় হেঁটে এসেছিল এবং পুনরায় চলে গেল— বিনয়ের কবিতার এসব শব্দ এমন এক ধরণের ভাবনা জন্মায় যা বাস্তববাদী গাণিতিক চেতনার কবির সঙ্গে যেন মেলে না। না, বিনয় প্রেমিক হতে পারেন না, নারীসঙ্গ কামনা করতে পারেন না, এটা বলার উদ্দেশ্য নয়; বরং বলা ভাল যে, বিনয় মজুমদার পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত তার ভাবনাকে প্রসারিত করেছেন, গাণিতিক চেতনায় আপন ভাবনাকে শাণিত করেছেন, তিনি যথার্থ অর্থেই প্রেমিক। ভালবাসাই বিনয়ের জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁর কবিতার মূল সুর—ভালবাসা তাঁর গায়ত্রীমন্ত্র। তাঁর ভালবাসায় কোন রহস্যময়তা নেই; গাণিতিক বিশ্লেষণের মত স্পষ্ট। একথা আরও স্পষ্ট হয় যখন বিনয় বলেন, 'আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে গিয়েও সঙ্গমের আনন্দ পাই।' এরপেরও কি 'ব্যর্থ প্রেমিক', 'হতাশার শিকার' ইত্যাদি বিশেষণ বিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? যিনি 'জীবন ফুরিয়ে গেলে দ্বিতীয় জীবন শুরু হয়...' বলে মনে করেন তিনি তো নিয়ত নিজেকে ভেঙ্গে নিজেকে গড়েন। এবং এই ভাঙ্গা-গড়ার কঠিন প্রক্রিয়ায় যিনি ব্যাপৃত, তাঁর কাছে হাতাশা অবশ্যই প্রত্যাশিত নয়, ছিলও না। প্রাণীর অসুস্থতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বিনয়ও অসুস্থ হয়েছেন। হতেই পারেন। তা সত্ত্বেও :

তাকাই সামনে সোজাসুজি
ব্যাকুল আশায় তাকে খুঁজি

গাণিতিক চেতনার কবি বধির আঁধারে দু-চোখ ধারালো করার সাহস পান; কেননা তিনি জানতেন জীবন রক্ষার প্রয়োজনে আদিকাল থেকে মানুষের চেতনায় স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি মৌল আবেগ। বিশ্বপ্রকৃতির পরিকল্পনায় এদের নির্ধারিত স্থান আছে। নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কেই তাদের অবস্থান বজায় রাখা জরুরী। যেমন ভয়। স্থানাঙ্কের বাইরে মাত্রাহীন ভয় অগ্রগতি শুধু নয় অবস্থানকেই বিপন্ন করতে পারে। কেননা অতি ভয়ে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন নিজেকে চালিত করার স্বাভাবিক শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। আবার একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, ভয়ের নির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে বিপদের হাত থেকে জীবনকে রক্ষা করা। মানুষ মরণশীল; তবু মৃত্যু ভয়ই ব্যক্তির মৃত্যুকে অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হতে সাহায্য করেছে। মৃত্যুভয় জীবনকে খণ্ডন করে না, মহাজীবনের স্রোতকে নিত্য নবীন ও বহমান রাখবার পথ রচনায় পথ দেখায়, সাহস জোগায়। ভয়কে নতুন চেতনায় দেখে— 'মৃত্যু উন্মুক্ত করে দিয়েছে জন্ম থেকে জন্মান্তরে মনুষ্যত্বের অন্তহীন বিকাশের নব নব সম্ভাবনার ধারাকে।' এভাবেই মানুষ অতিক্রম করে ব্যক্তিগত মৃত্যুভয়কে। প্রেমিক কবি, গাণিতিক চেতনার কবির ভাবনার মৃত্যু এই চেতনা বলেই কি ঘোষিত হয়নি? হতাশা তো বিনয়ের ভাবনার মৃত্যু, জীবনের মৃত্যু ডেকে আনতে পারতো। তা তো হয়নি। মৃত্যুশয্যায় তিনি সাহিত্যের রাজ্যে কল্পলোকে নিজের জীবন্ত অবস্থান ঘোষণা করেছেন তার শেষ কবিতায় $(-১)^{১/২}$ সংখ্যা ব্যবহারে। এখানেই কবি বিনয়ের সার্থকতা।

বৃক্ষও বেঁচে থাকে, বাঁচে পশুপাখিরা। এইসব বাঁচার মধ্যে আসল বাঁচা যেখানে মনের সঙ্গে যুক্ত হয় মনন। মানুষ তো বাঁচতে চায় মননকে আশ্রয় করে। তারই কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে তার কর্মকাণ্ডে। মানুষ সুখসন্ধানী হলেও মানবজীবনের মূল সিদ্ধান্তগুলো তাই যেন সুখ-দুঃখের হিসাবের বাইরে। কবিরা সুখী হন বা না হন কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর উপায় নেই। তার মধ্যে, কিছু কবি হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কথা লেখেন কবিতার ভাষায়। সুখের সন্ধান নয়, অনিবার্য এক প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণই যেন সেই সব কবির মূল কথা। সুখবাদীদের মতে মানুষ যা করে তা সুখের আশাতে করে। তাদের ভাষায় ভোগীর ভোগ, ত্যাগীর ত্যাগ সবই সুখের আশায়। হৃদয় খুঁড়ে যে বেদনা জাগায়, সে সুখের আশায়ই হৃদয় খুঁড়ে। তাই সুখবাদী দর্শনে সুখের অধিক হৃদয়ের গভীরতর বার্তা অধরাই থাকে। বিনয় মজুমদার আর যাই হোন সুখবাদী নন, সত্যানুসন্ধানী; নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের সন্ধানী এবং সত্যানুসন্ধান ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে মৃত্যুর পরে জীবন্ত দেখতে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

বিনয় মজুমদার প্রেমিক। প্রেম তো সচেতনার স্বাভাবিক লক্ষণ। বিনয় মজুমদারের প্রেমের বিস্তৃতি নক্ষত্রালোক পর্যন্ত। বিমূর্ত ও মূর্ত চিন্তার এক অপরূপ সমাহার ঘটিয়েছেন বিনয় তাঁর প্রেম ভাবনায়। অবশ্যই নারীর প্রেম তাঁকে উদ্বেলিত করেছে।

ভালবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়—

হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনও ওড়ে না; তবু ভালবাসা দিতে পারি আমি।

আবার লেখেন :

আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হ'য়ে, জয় হ'য়ে চিরন্তন কাব্য হ'য়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।

চিরন্তন হবার বাসনা। কিন্তু কোথায়? বিশুদ্ধ দেশে। '...বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন /সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।' কয়জন প্রেমিক পারে এভাবে ভাবতে! তারপরেও কি বলতে হবে, বিনয় মজুমদার কোন বিশেষ নারীর সঙ্গলাভে বঞ্চিত পাগল কবি!

হ্যাঁ, বিনয় মজুমদার এক বেদনাক্লিষ্ট কবি। যে প্রেক্ষাপটে কবির জন্ম বৃদ্ধি ও বিকাশ তা থেকেই তাঁর বেদনার জন্ম। কবিতা লেখার মাধ্যমেই কবি সেই দুঃখ ভুলতে চেয়েছেন:

লিখতে লিখতে বুঝেছি, কবিতা লিখলে দুঃখ ভোলা সম্ভব।
কিন্তু দুঃখ ভুলে গেলে আর কবিতা লেখা যায় না।

বিনয়ের এই চেতনাবোধই 'আমি গণিত-আবিষ্কর্তা' কবিতার জন্ম দেয় 'আমার ছেলের নাম কেলো, বৌ রাধা'-র মত পংক্তি। মনে রাখতে হবে, 'রাধা' অসামান্য প্রেমের প্রতীক এবং 'কেলো' নামটি সাধারণত অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত পরিবারের সন্তানের আদুরে ডাক নাম। 'রাধা' এবং 'কেলো' শব্দের মেলবন্ধন যে কবিতায় ঘটানো হয়েছে সেই কবিতাটির নাম কি, না 'আমি গণিত-আবিষ্কর্তা'। বিনয় মজুমদারই একাজ করতে পারেন; কেননা তাঁরই ভাষায় : পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষ কেমন ছিলেন, পূর্বপুরুষের কথাবর্তা চিন্তাভাবনা জানার একটি উপায় হচ্ছে বর্তমানকালের কুলি, মজুর, চাষি ইত্যাদিকে লক্ষ্য করা। বর্তমানকালের কুলি, মজুর চাষি ইত্যাদি কথাবর্তা এখন যেমন বলে আপনার পূর্বপুরুষও পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মোটামুটি তেমন কথাবার্তা বলত।

১৯৮৬ সালে এক দিনপঞ্জিতে কবি লিখেছেন, 'আমি সারাদিন অঙ্ক কষি, কবিতা লিখি না।' আবার বলেন, 'আমি এখন জ্যামিতি নিয়ে ভাবি। জ্যামিতির লোভে ওরা পাগলের ঔষধ খাওয়ানো বন্ধ করেছে। আমাকে যদি আবার পাগলাগারদে নিয়ে যায়, তাহলে আমি জ্যামিতি নিয়ে তৈরী আছি। সব জ্যামিতি আমি দিই নি। সব দিয়ে দিলে আবার পাগল বানাবে। জ্যামিতি আমার হাতিয়ার। এর লোভে ওরা কিছু করে না।' অর্থাৎ জ্যামিতিকে ক্ষেপণাস্ত্র করতে চেয়েছেন বিনয় মজুমদার। যে বিনয়ের কাছে বৃত্তপথই সহজতম পথ তা গ্রহণীয়; যেন তা তাঁর জীবন পথ। 'বিনয়-বৃত্ত' সর্বদাই গাণিতিক আবহে সুরময় ও মসৃণ।

এই সুর, এই মসৃণতার চরম সৌন্দর্যায়ন ঘটেছে বিনয় প্রতিভায়। যথার্থভাবে বিনয় প্রতিভায় যেন সৌন্দর্য 'a modified application of truth' 'a function of truth'। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী এস. চন্দ্রশেখর Truth and Beauty-র যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন বিনয়ের কবিতায় তা প্রতিভাত। কবিরা যে রূপের পূজারী সেই রূপের সঙ্গে গাণিতিক অর্থময়তা অবলীলায় মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতাগুচ্ছ, যা অনন্য।

অরুণেশ ঘোষ লিখেছেন : এমন একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিনয় পাগল হয়ে গেছে আর সেই উন্মত্ত অবস্থার মধ্যে লেখা হয়েছে, 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাগুচ্ছ। আরও গুজব ছিল, এমন একটি অভিজাত, উঁচু বংশীয় আর সুন্দরী মেয়েকে সে দূর থেকে ভালবাসত—যে ঘুণাক্ষরেও নাকি ধারণা করতে পারেনি কোনো উন্মাদপ্রায় কবি তাকে ভালবেসে লিখে ফেলেছে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলি। এই গুজবের রেশ এখনও রয়ে গেছে।

এই গুজবের রেশ এখনও রয়ে গেছে বলেই এতক্ষণ এমন কতকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলো যা মূল আলোচনায় যাওয়ার ভিত রচনা করলো।

'মহান মৃতের প্রতি—একজন জীবিত'র লেখকই লেখেন, 'এতো প্রেমের কবিতা নয়, কী আশ্চর্য! একবার ভাবি, প্রেমে পাগল একজন কবি তো প্রেমেরই পদ্য লিখবে—কিন্তু এ তো জীবনের এমন সত্যান্বেষণের কবিতা যার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আমাদের ছিল না।'

আগেই মিথের কথা উল্লেখিত হয়েছে। নগণ্য জীবিত সেই প্রশ্নই করেছেন।

২০০৫-এর মে (১৪১২ বৈশাখ) গ্রন্থি-র শিল্প আলোচনা সংখ্যায় প্রকাশিত বিনয় মজুমদারের সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ উল্লেখ করি :

গ্রন্থি : আলোচনার শুরুতে আপনি বলেছিলেন 'ফিরে এসো, চাকা'-তে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা আছে। সে কি প্রেম, যার অপর নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী? কীভাবে তার প্রতি মনোযোগী হলেন?

বিনয় : আরে, আমি তো ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তা সেখান থেকে হলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। আর গায়ত্রী প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এই কথা যেই জানলাম, অমনি মনে হল, এ মেয়েও তো আমার মতো ডুবে যাবে, কেননা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়ার পর আমার পতন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে কবিতার বইটি লিখে ফেললাম : 'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে' মানে একবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েই 'দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে পুনরায় ডুবে গেল' অর্থাৎ জীবনে আর কিছুই করতে পারল না।

গ্রন্থি : কিন্তু গায়ত্রী চক্রবর্তী তো তলিয়ে যান নি। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বর্তমান পৃথিবীর সেরা স্কলার। উত্তর আধুনিকতার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রায় তুলনাহীন, দেরিদার মূল্যায়নে ক্রিস্টোফারনরিস-দের চেয়ে কোনো অংশে কম যান না। এছাড়া সমাজতত্ত্বের আধুনিক নানা মতবাদ বিষয়েও তাঁর অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিনয় : আরে, আমি ওকে নিয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখলাম বলেই না এত সব হলো।

গ্রন্থি : বেশ, তা নয় হলো, কিন্তু খোদ কবির যে অবস্থা ফিরলো না! তার তো একা একা দূর গ্রামে কেটে গেল গোটা জীবন।

বিনয় : আমি কোনও দিন কিছু চাইনি।

'ঈশ্বরীর' নামকরণ নিয়ে কোন ধাঁধা থাকার কথা ছিল না। 'পরস্পর ভালবেসে শুয়ে আছি ঈশ্বরী আমি ও সময়'-এর লেখকের ঈশ্বরী-কে স্বচ্ছ ধারণা উদ্‌গত হতে পারে একটি সাক্ষাৎকারের ছিন্নাংশ, যা নীচে উল্লেখিত, থেকে।

শামীম : আপনার কবিতার 'ঈশ্বরী'র সঙ্গে আপনার কি এখনো যোগাযোগ আছে?

বিনয় : 'ঈশ্বরী' আদৌ আছে কিনা তাই জানি না।

মানসী সরকার : তাহলে 'ঈশ্বরী' বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

বিনয় : ঈশ্বরের বইয়ের নাম ঈশ্বরী। সে তো বইতে ছাপাই আছে—ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলো ঈশ্বর পাটনি / একা দেখি কুলবধূ কে বটো আপনি'—এই বলে তো ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কবিতা লিখেছেন। পলাশি যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর আগে। এখনো ক্লাস টেনে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ায়। সেই 'ঈশ্বরী' আজও আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আছে, এই ধারণা নিয়েই লিখেছি। (লোক/ বিনয় মজুমদার সংখ্যা /বইমেলা/২০০১)

নক্ষত্রের আলোয় দেখা ফিরে এসো, চাকার আহ্বায়ক আমার ঈশ্বরীকে যখন সাজান, তখন কালানুক্রমিক যাত্রাপথে পাদচারণা করলে মনে পড়ে 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' আর তখন 'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; কলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

পাগলামি নয়, নয় কোনো হতাশার প্রতিফলন, 'ফিরে এসো, চাকা' এক সচেতন বিশ্লেষণের কাব্য ভাবনা। আবার বলতে হয়, বাংলা নাটক, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের দিক থেকে ছয়ের দশক এক ব্যতিক্রমী দশক। পৃথিবীকে বদলে ফেলার অমোঘ প্রেরণা রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র সব কিছুকে এনে এক মোহনায়—বিনয় মজুমদারের প্রেম ভাবনা, কাব্য ভাবনা গাণিতিক চেতনার মিশ্রণে এক অপরূপ রূপ পেয়েছিল তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে।

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। 'গায়ত্রীকে' নামকরণ নিয়ে মিথের শুরু। অনেক সময় মিথ যেন সত্য মনে হয়।

বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র-এর সম্পাদক শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যসমগ্রের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে লিখেছেন, গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছিলো। সে-ই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য করে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বইয়ের নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।

এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে বলে
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু।
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়। (১৯৬২ ফিরে এসো, চাকা)

সত্যিও তো, মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়। তবে কি মানুষ প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম! তাই কি 'মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।' এ হয়তো সত্য। তবু অমৃত সন্ধানী মানুষ আছে, যাঁরা প্রারম্ভিক আস্বাদনে তৃপ্ত না হয়ে কালান্তরে যেতে চান।

কেন যেন স'রে যাও, রৌদ্র থেকে তাপ থেকে দূরে।
ভেঙ্গে যেতে ভয় পাও, জাগতিক সফলতা নয়,
শয়নভঙ্গির মতো অনাড়ষ্ট স্বকীয় বিকাশ
সকল মানুষ চায়— এই সাধনায় লিপ্ত হতে
অভ্যন্তরে ঘ্রাণ নাও, অযুত শতাব্দীব্যাপী চেয়ে
মস্তিষ্কে সামান্যতম সাধ নিয়ে ক্লিষ্ট প্রজাপতি
পাখাময় রেখাচিত্র যে-নিয়মে ফুটিয়ে তুলেছে
সে-নিয়ম মনে রাখো; ঢেউয়ের মতোন খুঁজে ফেরো।
অথবা বিশ্বের মতো ডুবে থাকো সম্মুখীন মদে।
এমনকি নিজে নিজে খুলে যাও ঝিনুকের মতো,
ব্যর্থ হও, তবু বালি, ভিতরে প্রবিষ্ট বালিটুকু
ক্রমে ক্রমে মুক্তা হয়ে গতির সার্থক কীর্তি হবে।
শয়নভঙ্গির মতো স্বাভাবিক, সহজ জীবন
পেতে হলে ঘ্রাণ নাও, হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ। (১৯৬২, ফিরে এসো, চাকা)

সহজ জীবন পেতে হলে ঘ্রাণ নাও, হৃদয়ের অন্তর্গত ঘ্রাণ। 'ফিরে এসো, চাকা'য় স্পষ্ট আহ্বান। তবু সহজ জীবনের সন্ধান নয়। 'ফিরে এসো, চাকা' নাম পাল্টে 'আমার ঈশ্বরীকে' করলে মিথ যেন আবার নতুন মাত্রা পায়। যদিও সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন, গাণিতিক চেতনা হতাশার শিকড় উৎপাটন করে, জীবনী শক্তির রস সিঞ্চন করে। বিনয় মজুমদার গাণিতিক চেতনার কবি। ১৯৩৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বার্মায় জন্মাবার পর প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে ভারতের পশ্চিম বাঙলায় এসে প্রতিকুল পরিবেশে পড়াশোনা করে কৃতী ছাত্রের শিরোপা নিয়ে সমাজের গতানুগতিক জীবনধারণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সুখী শান্ত সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে না পারায় (অথবা হেমিংওয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, যা ওঁর সমসাময়িক অনেক কবিই হয়েছিলেন, Live dangerously জীবনযাপন করতে আগ্রহী ছিলেন) এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে নিজেকে অনেকখানি এগিয়ে রাখায় সৃষ্ট সমাজবিচ্ছিন্নতা তাকে নিয়ত বিদীর্ণ করেছে বলে তিনি আত্মহননের পথে পা না বাড়িয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপন পথে অবিচল থেকে গণিত নিয়ে ভেবেছেন, গণিতকে ভালবেসেছেন, অঙ্ক-ভাবনাকে কবিতায় সাজিয়েছেন, গণিতের মাধুরী মাখানো পুষ্প ফুটিয়েছেন— যা শত পুষ্পের মাঝে নিজস্ব বৈশিষ্টে প্রতিভাত। বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই নব মঞ্জরী আজ সার্বজনীন হবার প্রত্যাশা করে।

'ফিরে এসো, চাকা' অগণিত কবিতা প্রেমিকের একান্ত হৃদয়ের গীতা নয়, জীবন ছন্দে গতিশীলতার আহ্বান। স্থবিরতা বর্জনের আহ্বান।

বিনয় মজুমদার জানেন, প্রগতির গতি আনতে গতি ছাড়া গতি নেই। আর গতির প্রতীক হচ্ছে চক্র বা চাকা। প্রগতির পূজারী কবি তাই 'চাকা'-র আহ্বান জানান।

বিনয় মজুমদার জানতেন রবীন্দ্রনাথের উক্তি : মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিল। আদান প্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল জোট বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা। কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি, 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন :

রজনী শঙ্খ ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। প্রেম তো গতিহীন নয়, অগ্রগমনের প্রেরণা। তাই কবির 'ফিরে এসো, চাকা' / রথ হয়ে জয় হয়ে চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো'। শাশ্বত গতির দ্যোতক। 'চাকা' প্রগতির প্রতীক। প্রগতির পূজারী কবি বিনয় মজুমদার চাকাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। 'রথ হয়ে জয় হয়ে' অগ্রগমনের বার্তা নিয়ে আসার জন্য আকুল আহ্বান—এ তো কবির সার্থক ভাবনা। যারা এর মধ্যে হতাশার ধ্বনি খোঁজেন, তাদের সঙ্গে কিছুতেই সহমত পোষণ করা যায় না; কেননা 'রথ' এবং 'জয়' শব্দদ্বয় যুদ্ধ জয়ের ব্যঞ্জনা। জয়ের 'বাসনা চিরন্তন কাব্য'-এ পরিণত হবার বাসানায় আর যাই হোক হতাশা বলা যায় না। মিলটনের কবিতা বা হেলেন কিলারের অনুভূতিতে কি হতাশার সুর শোনায়? গাণিতিক চেতনার কবি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে যখন সব দেখেন তখন ছোটখাটো আঘাত বেদনা তাকে আহত করতে পারে না; বরং তা চেতনাকে সমৃদ্ধ করে অগ্রগমনে উৎসাহ দেখায়। তখন আহত ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত কবিই তো আপন অনুভূতির মাধুরী মিশায়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার পথ দেখাতে পারেন। কালজয়ী কবি তাঁর সমকাল দ্বারা আক্রান্ত হবেন না, কবির সমকালের বন্ধুর পথের হাঁটতে গিয়ে কন্টকাকীর্ণ হবে না এটা কি করে হয়! কুসুমাকীর্ণ মসৃণ পথ তো গতানুগতিক পথিকের পথ। সৃষ্টির আনন্দই বা তাতে কোথায়! সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতোয়ারা হবার সুযোগ সেখানে থাকে না।

রক্তে-রক্তে মিশে আছে কৌতুহল; লিপ্ত কৌতুহল;
বীজের ভিতরে আছে গুহার লালসাময় রস।
নতুন ঘরের আলো, পার্বত্য ফুলের চিত্রগুলি
মনকে নিয়েছে টেনে চারিদিকে, ছিন্নভিন্ন বেশে।
(১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, ফিরে এসো, চাকা)

নব নব সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুখ-দুঃখ আঘাত ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে বিনয় মজুমদারই পারেন, 'ফিরে এসো, চাকা'-র মতো কালজয়ী কাব্য লিখতে, কেননা সাম্প্রতিককালের এক কবির মতো তিনি জানতেন,

জীবন তো চলমান শকট
সুখ-দুঃখের রাঙাধুলো পথে
নিত্য তার চাকার
ঘূর্ণন....

তারই মধ্যে মানুষকে বাঁচতে হয়, সৃষ্টি করতে হয় স্বল্প পরিসর জীবনে। শুধু দিনগত পাপক্ষয় নয়, সৃষ্টির আনন্দেই মানুষের পরাজয় প্রতিহত হয়। গতিময় জীবনে তাই কবির 'ফিরে এসো, চাকা' এক অনন্য বার্তাবহ এবং সেজন্যই কাব্যটি কালজয়ী।

বিনয় লিখেছেন :

আমি যেই কেঁদে উঠি অনির্বাণ আঘাতে আহত
তখনি সকলে ভাবে, শিশুদের মতোই আমার
ক্ষুধার উদ্রেক হলো, বেদনার কথা বোঝে না তো।

কালজয়ী কাব্য-র রস, অর্থ প্রেক্ষাপট বোঝা জরুরী সমস্ত বিভ্রান্তি পরিহার করে। তবেই চাকার গতি ফিরবে সৃষ্টি রহস্যের নব নব গতিধারায়। ❑